লোকপ্রশাসন সাময়িকী
৫ম সংখ্যা মার্চ ১৯৯৬, চৈত্র ১৪০২

বাংলাদেশ ও ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বাসমূহ

গোলাম মোস্তাকীম*

১.০ ভূমিকা

১.১ কবি বলেছেন "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।" এটা একটা সর্বজনীন বাণী। আমরা যদি এ কথাটা মনে রাখি এবং মেনে চলার চেষ্টা করি; তাহলে আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারি। কিন্তু নানা কারণে আমরা কথাটা ভুলে যাই। ফলে মানবতা ও মনুষত্বের অবমাননা ঘটে যায়। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য আমাদের চতুর্দিকের মানবগোষ্ঠীকে পুংখানুপুংখরূপে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। তাদের সুখ-দুঃখ ও আনন্দ বেদনার কথা আমাদের জানতে হবে, ভাবতে হবে এবং সম্ভব হলে তার প্রতিকারের জন্য সাধ্যানুযায়ী আমাদের চেষ্টা করতে হবে।

১.১ ফরাসি ভাষায় একটি কথা আছে। কথাটির অর্থ হল, 'সব বুঝতে পারলেই সব ক্ষমা করা যায়।' বক্ষমান প্রবন্ধে আমাদের বাংলাদেশে যে সকল ক্ষুদ্র জাতি রয়েছে, তাদের পারিবারিক, সামাজিক, শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক জীবন নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করা হল।

২.০ ক্ষুদ্র জাতি

২.১ আমাদের বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্ম, সম্প্রদায় ও জাতিগত গোত্রের লোকজন দীর্ঘকাল ধরে বসবাস করে আসছে। সকল সম্প্রদায় ও জাতিই নিজ নিজ মহিমা ও বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। এছাড়াও আমাদের দেশের নানা স্থানে বিভিন্ন উপজাতি তথা ক্ষুদ্র জাতিসমূহ রয়েছে। বর্তমান পার্বত্য জেলাসমূহের প্রাকৃতিক নিসর্গে বসবাস করছেন চাকমা, তংচঙ্গ্যা, মগ, কুকি, লুসাই মুরং, টিপরা, সেন্দুজ, পাঙ্খো, বনযোগী ও খুমিরা। কক্সবাজারের মগ, সিলেটের মনিপুরী ও খাসিয়া, ময়মনসিংহের গারো ও হাজং, রংপুর-রাজশাহী, দিনাজপুর ও বগুড়ার ওরাওঁ, সাঁওতাল ও রাজবংশীদের কথাও উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে অধিকাংশ লোকজনই বিভিন্ন পাহাড়ি এলাকা ও বন-জঙ্গলে বসবাস করে থাকে। আমাদের থেকে একটু দূরে বাস করলেও তারা সবাই আমাদের দেশেরই নাগরিক। তাদের সুখ-দুঃখ এবং আমাদের হাসি-বেদনার মধ্যে অনেক মিল রয়েছে। এ সকল জনগোষ্ঠীর অনেকে নিরক্ষর হলেও তারা অশিক্ষিত

---

* উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

(uncultured) নয়। তাদের সবারই রয়েছে নিজস্ব পারিবারিক ও সামাজিক জীবন এবং তাদের সরল জীবনযাত্রা থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে।

২.২ বর্তমানের ৩টি পার্বত্য জেলাকে কিছুদিন আগেও পার্বত্য চট্টগ্রাম নামে অভিহিত করা হত। এই এলাকার অধিবাসীদের অধিকাংশই বৌদ্ধ এবং তাদের মধ্যে হিন্দুদের পারিবারিক প্রভাব বেশ দেখা যায়। ১৯৫১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী এ এলাকার লোক সংখ্যার বিভাজন ছিল নিম্নরূপঃ

সমগ্র লোক সংখ্যার পরিমাণ	২৮৭,৬৮৮
ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বাভুক্ত লোকজন	২৬১,৫৩৮
বাঙ্গালী	২৬,১৫০
এদের মধ্যে পাহাড়ি লোকজনের বিভাজন নিম্নরূপঃ	
বন	৯৭৭
চাকমা	১২৪৭৬২
খিয়াং	১৩০০
খুমি	১৯৫১
কুকি	১৯৭২
লুসাই	১৩৬৯
মগ	৬৫৮৮৯
মুরং (মুরো)	১৬১২১
পাঙ্খো	৬২৭
রিয়া	১০১১
তংচঙ্গ্যা	৮৩১৩
টিপরা	৩৭,২৪৬

(পিয়ের বেসিনাঁ, ১৯৫৮, পৃঃ ৪)

২.৩ উপরের ১১টি দলের মধ্যে ৫টি দল; যথা চাকমা, মগ, মুরং, টিপরা ও তংচঙ্গ্যাদের সংখ্যা অন্যান্যদের তুলনায় অনেক বেশী। এ এলাকার লোকজনের চালচলনে সমতল ভূমির লোকদের থেকে অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

৩.০ চাকমা

৩.১ মগ ও চাকমারা সাধারণত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। টিপরারা হিন্দু ধর্ম অনুসরণ করে থাকে। অন্যান্যরা নিজেদেরকে বুদ্ধের অনুসারী বললেও তাদের ধর্মীয় অনুশাসন ও সামাজিক আচার–আচরণে অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

৩.২ কর্ণেল ফেইরী মনে করেন যে চাকমারা মিয়ানমার থেকে তাদের বর্তমান আবাসভূমিতে এসেছে।

৩.৩ পার্বত্য জেলাসমূহের ক্ষুদ্র জাতির অধিবাসীরা যে এখানকার ভূমিজ সন্তান নয় এবং তারা যে বাইরে থেকে এখানে এসেছে তা নৃতত্ত্ববিদ ও ভাষাতত্ত্ববিদগণ গবেষণা করে জানিয়েছেন। অনেক প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করে চাকমারা বর্তমান অবস্থায়

এসেছে এবং তাদের ধর্ম, ভাষা ও আচার-ব্যবহারের সঙ্গে বিভিন্ন ধর্মের অনেক রীতিনীতি ও বৈশিষ্ট্য মিশে গিয়েছে।

৩.৪ স্যার রিজলী মনে করেন যে, ব্রহ্মভাষার "সাক" বা সেক জাতি থেকে চাকমাদের উৎপত্তি এবং তারা একসময় আরাকানের প্রাচীন রাজধানী রামাবতী নগরের নিকটবর্তী অঞ্চলে খুব প্রবল ও প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠে। তাদের সাহায্যে ব্রহ্মরাজ ন্যাসিং ন্যা থৈন ৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন অধিকার করেন। তখন পশ্চিম দেশের অনেক লোক ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য তথায় আগমন করে এবং পরে উপনিবেশ স্থাপন করে। তারা সাক বা সেক নামে অভিহিত হত। অনেকে মনে করেন এসব সাক বা সেক শব্দ ইসলামী 'শায়খে'র অপভ্রংশ।

৩.৫ মগরা মনে করে যে পরাজিত মোগল সৈন্যদের ঔরসে ও আরাকানী মেয়েদের গর্ভে যে জাতির উদ্ভব হয়েছিল তারাই সাক বা সেক। কিন্তু চাকমারা স্বয়ং এসব বিশ্বাস করে না। তারা মনে করে, মগভাষায় 'শাক্য' অর্থ সাক' এবং যারা রাজার ঘরে জন্ম গ্রহণ করেছে তাদেরকে বলা হয় সাকমাং (মাং রাজা অর্থে) 'চাকমা' শব্দ এসেছে এই 'সাকমাং' থেকে। চাকমারা এই বিশেষ কথাটির ওপর বেশ গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। তাদের এ নিজস্ব মতামত এবং মগদের এ ভাষাগত অর্থের পরিপ্রেক্ষিতেই তারা প্রমাণ করতে চায় যে, তারা শাক্যবংশসম্ভূত মহামুনি বুদ্ধের বংশধর।

৩.৬ চাকমা সমাজে অনেক ধর্মানুষ্ঠান করা হয়। 'বিষু' 'ওয়াছ', 'ওয়াগ্যা' এবং 'মাঘী পূর্ণিমা' ইত্যাদি সমস্তই বৌদ্ধ ধর্মের অনুষ্ঠান। বিষু বা মহাবিষ্ণুর সংক্রান্তি চাকমা ও মগ সমাজে প্রধান ও পবিত্র পর্ব হিসেবে বিবেচিত হয়। বসন্তের শুরুতে চৈত্রমাসে এ পর্বের অনুষ্ঠান হয়। মহামুনি বুদ্ধের মূর্তি যে মন্দিরে স্থাপিত হয় তাকে 'ক্যাং' বলে এবং সেখানেই এ পর্বের আয়োজন করা হয়। এছাড়া অন্যান্য পর্ব হিন্দুধর্মের অনুসরণে অনুষ্ঠিত হয়। দান-দক্ষিণা, ধর্মকথা শ্রবণ এবং ভিক্ষু খাওয়ানো এদের প্রত্যেক অনুষ্ঠানের অবশ্য করণীয় কর্ম।

৩.৮ চাকমাদের ধর্মগ্রন্থের মধ্যে নিম্নলিখিত আটাশটি প্রধান ঃ

১। আগর তারা ২। সবধিবংগিরি তারা ৩। আনিজা তারা ৪। আরেন তামা তারা ৫। সিগল মোগল তারা ৬। সরকদান তারা ৭। দাসা পারামি তারা ৮। বড় কুরুক তারা ৯। ছোট কুরুক তারা ১০। স্ত্রী পদুরা তারা ১১। সুরাদিজা তারা ১২। পুদম্ ফুলু তারা ১৩। ফুদুম্ ফুলু তারা ১৪। সাহস ফুলু তারা ১৫। চেরাক ফুলু তারা ১৬। স্বামী ফুলু তারা ১৭। রাখেম্ ফুলু তারা ১৮। মালেম তারা ১৯। ত্রিকুদ্দ তারা ২০। তান্ত্রিক শাস্ত্র তারা ২১। জিয়ন ধারণ তারা ২২। সবা দিবা তারা ২৩। বুদ্ধ ফুলু তারা ২৪। আজিনা তারা ২৫। সাক সুক্তন তারা ২৬। শাক্য তারা ২৭। ফকিরি তারা ২৮। আঙারা সূত্র তারা।

৩.৯ পৃথিবীতে প্রচলিত অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের মত চাকমাদের ধর্মগ্রন্থগুলোতেও আমরা নীতিকথা ও উপদেশবাণীর সমাবেশ দেখতে পাই। কিন্তু অনুবাদ ও প্রচারের অভাবে আমরা অনেকেই চাকমাদের ধর্মগ্রন্থগুলো সম্পর্কে অবহিত নই।

৩.১০ ধর্মগ্রন্থগুলো বিভিন্ন পূজায় ভিক্ষু বা রড়ি কর্তৃক পঠিত হয়ে থাকে। ধর্মগ্রন্থগুলোর ব্যবহার পদ্ধতির মধ্যে মাথা ধোয়া পর্বে 'বড় কুরুক তারা' ও 'ছোট কুরুক তারা' রাজা বা সম্মানী ব্যক্তির বিয়েতে 'সিগল মোগল তারা,' জাদি বা ধর্মপূজায় 'মালেম তারা', 'দাসা পারামি তারা' ও 'সাহস ফুলু তারা' মৃত ব্যক্তির মুখে পিণ্ড দিতে 'আনিজা তারা' রাজা বা সম্মানী ব্যক্তির মৃত্যুকালে 'আরেন্ তামা তারা' শ্মশানে দাহনক্রিয়া সম্পাদনের সময়' 'সাধ্বিংগিরি তারা', বার্ষিক শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে 'রাখেম ফুলু তারা' ভাদ্যা অনুষ্ঠানে ও পিন্ডদান পর্বে 'জিয়ন ধারণ তারা', 'সবা দিবা তারা', 'চেরাগ ফুলু তারা', 'বুদ্ধফুলু তারা', এবং 'সানেং ফুলু তারা', 'অগ্নির ভয় থেকে রক্ষাকল্পে 'সাক সুক্তন তারা', রোগ ব্যাধি নিরাময়ের জন্য 'তাল্লিক শাস্ত্র তারা', নীতিতে আহরণের জন্য 'ফকিরি তারা' পঠিত ও ব্যবহৃত হয়। এসব ছাড়া বাকি গ্রন্থগুলোকে শুধুমাত্র ধর্মকথা বা তত্ত্বকথা শুনবার জন্য পবিত্রজ্ঞান করা হয়। এমনকি চাকমা কবি শিবচরণ রচিত সাত পর্বে সমাপ্ত 'গোজেনের লামা' (ঈশ্বরের প্রশংসাগীতি) নামক গীতিকাব্যখানিও চাকমা সমাজে ধর্মগ্রন্থ হিসেবে পরিগণিত। (আবদুস সাত্তার, পৃঃ ৩৯)।

৩.১১ প্রায় দেড়শত গোষ্ঠী নিয়ে চাকমা সমাজ গঠিত এবং গোষ্ঠীগুলোর কর্তব্য হল পরস্পরকে সাহায্য করা–পরস্পরের বিপদে এসে সম্মুখে দাঁড়ানো। এ প্রসঙ্গে স্যার রিজলী বলেছেন, "Among the Chakmas, as perhaps, among the Greeks and Romans in the begining of their history, the sect is the unit of the tribal organisation for certain public purposes."

৩.১২ চাকমাদের সমাজে ভ্রাতৃভাব অত্যন্ত প্রবল এবং হিন্দু ধর্মের মত কঠোর শ্রেণী বিভাগ তাদের সমাজে নেই বললেই চলে। এক্ষেত্রে মুসলিম সমাজের সঙ্গে তাদের অনেক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

৩.১৩ চাকমা সমাজে বিয়েতে বেশ আনন্দ উৎসব করা হয়। এ সমাজে বৈধ ও অবৈধ বিয়ের ব্যাপারে কঠোর সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসন রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই তালাকের ব্যবস্থাও রয়েছে। তবে তালাক ব্যবস্থা হেডম্যান ও দশজন গ্রামীণ মাতব্বরের বিচারে নির্ণয় করা হয়।

৩.১৪ চাকমারা জীবিকার্জনের জন্য সাধারণত 'জুম' চাষের ওপর নির্ভরশীল ছিল। পাহাড়ের ঢালুর বনজঙ্গল পরিষ্কার করে এ চাষ করা হত। একই সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর বীজ বপন করা হত এবং পর্যায়ক্রমে ফসল তুলে নেয়া হত। চাকমারাও সমতল ভূমির বাঙ্গালীদের মত চাষাবাদে বর্তমানে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে।

৩.১৫ বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় পাবর্ত্য জেলাগুলোতে লোকসংখ্যা খুবই কম। নিচে ১৯০১ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত ৫০ বছরের লোকসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি দেখানো হল ঃ

আদমশুমারি	১৯০১	১৯৫১
খৃষ্টান	-	৩৭৫৫
চাকমা	৪৪,৩২৭	২,১৫,০০০
মগ	৩৪,৭০৬	
টিপরা	২৩,৩৪'	
হিন্দু	৩,৮৫৬	৩৪,২৫৪
কুকি	২,১৪৭	
খুমি		১৬,২০৫
মুরং	১০,৫৪০	
পাঙ্খোকনগোষ্ঠী	৯৩৭	
মুসলমান	৪,৯০৬	১৮,০৭০
	মোট ১,২৪,৭৬০	২,৮৭,২৭৪

(আবদুস্ সাত্তার পৃঃ ৬৩)

৩.১৬ চাকমাসমাজের সাংস্কৃতিক জীবন হিন্দু-মুসলিম ও বৌদ্ধ ধর্মের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে এবং পুষ্টি লাভ করেছে। চাকমা সমাজে অনেক প্রবাদ, ছড়া, পুরাকাহিনী, ইতিকথা, উপকথা, বারমাসী শোকগাঁথা, প্রেমসঙ্গীত ও ভাবসঙ্গীত প্রচলিত আছে। বাংলাদেশের লোকসাহিত্যে এসকল বিষয়াবলী এক অনন্য স্থান দখল করে আছে।

৪.০ তংচঙ্গ্যা

৪.১ তংচঙ্গ্যাদেরকে চাকমাদের অন্তর্ভুক্ত একটি জাতি হিসেবে গণ্য করা হয়। তাদের পূর্ব পুরুষ আরাকান প্রদেশে বসবাস করতেন। তাদের উদ্ভব নিয়ে বেশ কয়েক ধরনের মতবাদ আছে। তবে তারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও তাদের নানা রকম সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-আচরণে জড়োপাসনার লক্ষণ দেখা যায়। এর ফলশ্রুতিতে তারা চাকমাদের জাতীয় দেবদেবী ছাড়াও বৃক্ষ, ঝর্ণা, পাথর, পাহাড়পর্বত, নদীনালা ইত্যাদিকে দেবদেবীজ্ঞানে পূজা করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে তাদের ধর্ম বেশ সরল। এটাকে প্রকৃতির ধর্ম বলা চলে। তারা মনে করে প্রকৃতির মাঝেই এক ধরনের ঐশ্বরিক ক্ষমতা প্রভাব বিস্তার করে আছে।

৪.২ তংচঙ্গ্যারা সাধারণত ভদ্রতা নম্রতার ধার ধারে না। তাদের মধ্যে বহির্বিবাহ বা অন্তর্বিবাহের মত কোন ঝামেলা নেই। কারণ তারা মামাতো বোন ছাড়া কাউকে বিয়ে করতে পারেনা। বিয়ের সময় পাত্রকে দা, অস্ত্রশস্ত্র, বল্লম ইত্যাদি যৌতুক হিসেবে দান করার বিধান রয়েছে। এছাড়া আবশ্যিকভাবে ছেলেকে এক হাজার ডিম দিতে হয়।

৪.৩ তংচঙ্গ্যারা সাধারণত জুম চাষের ওপর নির্ভরশীল ছিল। ভাত ও মাছ এদের প্রধান খাদ্য। সাংসারিক ও ধর্মীয় যে কোন অনুষ্ঠানে মদ অপরিহার্য উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়।

৫.০ মগ

৫.১খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা ,বান্দরবান পার্বত্য জেলা, কক্সবাজার ও পটুয়াখালীর কলাপাড়া থানায় মগরা বসবাস করে থাকে, পটুয়াখালীর মগরা ১৭৮৯ সালে আরাকান থেকে বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে সুন্দরবন অঞ্চলে বসবাস করতে আসে।

৫.২ এক সময় মগদের অত্যাচারে সারা বাংলাদেশের লোক অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। এমনকি সুদূর ঢাকায়ও মগদের অত্যাচারের প্রভাব দেখা দিয়েছিল। মগবাজার এলাকা তার একটি চিহ্ন হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে। বাংলার সুবাদার, সম্রাট শাহজাহানের পুত্র শাহসুজা সুন্দর বন এলাকার মগদের দমন করার জন্য পটুয়াখালী জেলার সুজাবাদ গ্রামে একটি দূর্গ নির্মাণ করেন। সে দূর্গের ধ্বংসাবশেষ আজও দেখা যায়।

৫.৩ মগ বলতে যে আরাকানী জলদস্যু বোঝায় এটা মানতে শিক্ষিত মগরা রাজি নন। এখনও আমরা বলে থাকি "এটা কি মগের মুল্লুক"? মগরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তারা মনে করেন গৌতমবুদ্ধের জন্মভূমি মগধ থেকে মগ শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে।

৫.৪ প্রখ্যাত ভষাতত্ত্ববিদ ডক্টর গ্রীয়ারসন মন্তব্য করেন যে, "মগ কথাটি ইন্দোচীনভাষায় জাতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, মগরা আসলে ইন্দোচীন জাতির অন্তর্ভুক্ত।"

৫.৫ মগ বলতে অত্যাচারী বোঝায় বলে ১৯৬১ সালের আদমশুমারিতে মগরা নিজেদেরকে মগের পরিবর্তে 'মার্মা' নামে অভিহিত করতে অনুরোধ করে। এ কারণে মগদের অঞ্চলকে মার্মা অঞ্চল বলা হয়।

৫.৬ শিক্ষিত মগরা বৌদ্ধ ধর্মের আচারগুলো মেনে থাকে। তবে অশিক্ষিত মগদের ধর্মাচরণের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের অনেক অমিল দেখা যায়। প্রত্যেক পূর্ণিমাকে বৌদ্ধ ধর্মে অতি পবিত্র হিসেবে গণ্য করা হয়। মাঘ মাসের পূর্ণিমাকে 'তাবুং লাব্রে' বলা হয় এবং মগদের নিকট এই মাঘী পূর্ণিমা অতি পবিত্র। কারণ তারা মনে করে এ সময়ে বুদ্ধদেব ভ্রমণে বের হয়েছিলেন। 'থিজিয়ানা' নামে মগদের আর একটি উল্লেখযোগ্য উৎসব এ সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দুদের পুরোহিতদের মত রড়ি দ্বারা মগদের পূজাপার্বণ পরিচালিত হয়। 'থাদুক্কু' মগদের ধর্মগ্রন্থ।

৫.৭ এদের মধ্যেও গোত্র-বিভাগ রয়েছে। অনেক অনুসন্ধান করে আমরা পনেরোটি গোত্রের সন্ধান যেমন রিগ্রাইস্তা, পালেঙগস্তা, পালেংগীস্তা, কাউক দিনস্তা, ভেইর্মেনস্তা, সারুংগস্তা, ফারমে প্রোস্তা, স্মিউকাপিআস্তা,ছেড়েংগস্তা, মারুত্স্তা, সাবোচ্চস্তা, ক্রুংখিয়াংস্তা, তৈঅংসিয়ট, থিয়মস্তে, ও মাহলংস্তা। এ সব গোত্রের সবাই পূর্বপুরুষদের বাসস্থানের নামের সঙ্গে পরিচিত এবং সে বাসস্থান নদী-তীরবর্তী অঞ্চল (খিংথা) কিংবা পর্বতসংকুল গহীন অরণ্যভূমি টংথা। (আবদুস সাত্তার, পৃঃ ১৩৩)

৫.৮ মগদের সমাজ ব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক। তবে মজার ব্যাপার হল যে, চাষাবাদ বা অন্যান্য অন্ন সংস্থানের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ কাজ মেয়েরাই করে থাকে। মগ সমাজের পরিচিতি পুরুষপক্ষকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে।

৫.৯ মগসমাজে অন্তর্বিবাহ ও বহির্বিবাহ উভয় রীতিই প্রচলিত আছে। মগরা অপর জাতি থেকে স্ত্রী গ্রহণ করে না তবে তাদের মেয়েরা স্বেচ্ছায় ভিন্ন জাতি থেকে স্বামী গ্রহণ করলে তার সামাজিক স্বীকৃতি পেতে অসুবিধে হয় না। মেয়েরাই সাধারণত বর নির্বাচন করে থাকে। তবে সমাজের উচ্চতম স্তরের বিয়ে সাধারণত বাবা-মা অথবা অভিভাবকদের মতানুসারেই হয়ে থাকে।

৫.১০ অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতির লোকদের মত মগরাও জুম চাষের ওপর নির্ভরশীল ছিল। বর্তমানে এরা সমতলের বাঙ্গালীদের মত চাষাবাদে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। মহিলারা এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। মগ পুরুষদের অনেক সময় অলসভাবে জীবন-যাপন করতে দেখা গেলেও মগ মেয়েরা কখনই তা করে না। চাষাবাদ ছাড়াও মগ মেয়েরা কাপড় বুনন ও চুরুট তৈরী করে থাকে। নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে তারা এসব বাইরে রফতানি করে থাকে।

৬.০ কুকি

৬.১ কুকিরা এক সময় পার্বত্য ত্রিপুরা, আসাম ও লুসাই পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস করত। ১৮৬০ সালের পরে তারা বান্দরবান পার্বত্য জেলায় চলে আসে। গভীর অরণ্যে চলাফেরার সময় কুকিরা তাদের দলচ্যুত সঙ্গীদেরকে 'কু' শব্দে আহ্বান করে এবং প্রত্যুত্তরে প্রতিপক্ষ 'কি' শব্দে উত্তর দেয়। এ কারণে তারা সমতলভূমির অধিবাসীদের দ্বারা সম্ভবত 'কুকি' নামে অভিহিত হয়েছে। ১৯০১ সালের আদমশুমারির বিবরণীতে দেখা যায় যে "কুকি শব্দটি সত্যি সমতলভূমির অধিবাসীদের প্রদত্ত এবং এতে তারা টিপরা, চাকমা ব্যতীত অন্যান্য পাহাড়ী জাতিদেরকেই বোঝাতে চায়"।

৬.২ পুরানো কুকি ও নতুন কুকি এ দুই শ্রেণীতে কুকিরা বিভক্ত। নতুন কুকিরা 'থেতু' নামে পরিচিত। ধর্মীয় আচরণ ও সামাজিক ব্যবস্থায় এ দুই শ্রেণীর কুকিদের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও তারা একে অপরের কাছাকাছি থাকতে ভালবাসে। এ কারণে তাদের সমাজ সংহতির মধ্যে বেশ দৃঢ়তা দেখতে পাওয়া যায়।

৬.৩ কুকিদের মধ্যে আইমোল, অনল, চউতে, চিরু, কোহেলন, কোম, লামাং, পুরুম, টিকুপ ও ভইফেই নামে মোট ১০টি গোত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কাহিনী প্রচলিত আছে।

৬.৪ কুকিরা পাথিয়ান নামক এক দেবতায় বিশ্বাস করে যিনি আকাশে অবস্থান করেন এবং তাঁর আদেশেই বিশ্ব-ভুমন্ডল, গাছবৃক্ষ, জীবজন্তুসহ অন্যান্য সব কিছুর সৃষ্টি হয়েছে। জুলাই মাসে পামিয়ান দেবতার পূজা হয়। এ পূজা চা-পুই চোল্লাই নামে অভিহিত। পূজার দিনে দেবতার উদ্দেশ্যে শূকর উৎসর্গ করা হয় এবং প্রত্যেক বাড়িতে একটি করে মোরগ হত্যার আয়োজন করা হয়। পূজাতে নৃত্যগীত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। পাথিয়ান দেবতা ছাড়াও কুকিরা অসংখ্য দেবদেবীতে বিশ্বাস করে থাকে। তারা বিশ্বাস করে সৃষ্টির সব কিছুই কোন না কোন দেব-দেবী দ্বারা পরিচালিত হয় এবং এসবের মধ্যে তাদের প্রভাব রয়েছে। এ কারণে এসব বস্তুকেও কুকিরা দেবদেবীজ্ঞানে পূজা করে থাকে।

৬.৫ কুকিরা পরকালে বিশ্বাস করে না। তবে মৃত্যুর পরে সকল আত্মাকে এক অলৌকিক শক্তি নিয়ে যায় এবং আত্মারা 'মিথুখু' নামে একটি স্থানে অবস্থান করে। কুকিরা মনে করে এ স্থানটি গহীন অরণ্যে অবস্থিত একটি বিস্তীর্ণ এলাকা।

৬.৬ কুকিরা নিজেদের গোষ্ঠীর বাইরে থেকে স্ত্রী গ্রহণ করে থাকে। তবে প্রেমের কারণে কোন কুকি মেয়ে বাইরে বিয়ে করতে চাইলে সমাজ তাতে কোন আপত্তি করে না। কুকি সমাজে বিয়ের সময় মেয়ে পক্ষকে যৌতুক হিসেবে গয়াল, দা, বন্দুক, বল্লম, ছাগল, ইত্যাদি দিতে হয়। অনেক সময় এসব জিনিসের পরিবর্তে সমমূল্যের কাজ করে দেয়ার বিধান রয়েছে।

৬.৭ কুকিরা তাদের মৃত দেহকে কবর দেয়। কবর দেয়ার পূর্বে মৃত দেহের সম্মুখে বিভিন্ন ধর্মীয় আচার ছাড়াও ধর্মযাজক বা মুরুব্বী শ্রেণীর লোকেরা মৃতের আত্মার কল্যাণ কামনা করে নানা রকম মন্ত্র পাঠ করে এবং ইহজীবনের সঙ্গে যে মৃত ব্যক্তির সকল সম্পর্ক শেষ হল তাও বলা হয়।

৬.৮ কুকিরা পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা অনুসরণ করে থাকে। পিতার মৃত্যুর পর সর্বজ্যেষ্ঠ ও সর্বকনিষ্ঠ পুত্র সম্পত্তির ভাগ পেয়ে থাকে। মাঝের ছেলেরা অন্য দু ভাইয়ের কৃপার পাত্র হয়ে দাঁড়ায়।

৬.৯ সাহিত্য একটি সমাজের দর্পণ। কুকি সাহিত্য অজস্র পূরা কাহিনী, কথা, উপ-কথা, ছড়া, ধাঁধাঁ, লোকগীতি, প্রবাদ, সৃষ্টিতত্ব কাহিনী, আদি মানব-মানবীর উদ্ভব সম্পর্কিত কাহিনী, বাঘ-যাদু ইত্যাদিতে ভরপুর। অন্যদিকে কুকি লোক-গীতিগুলোর সাহিত্যমূল্যও বেশ উচ্চ স্তরের। নিচে একটি কুকি গানের উল্লেখ করা হল ঃ

তোমার ও রূপে যেন রূপ খেলা করে,
সুডৌল মুখের বৃন্তে ফুল ফুটে আছে।
তোমাকে পাবার আশা হৃদয়ে আমার,
অথচ তোমার মন চায়না আমাকে।
আমাকে দাও না এসে তোমার ঢোলক,
ঢোলক বাজাব আমি তব চার পাশে।
তুমি তো রূপসী মেয়ে, তোমার ও রূপ
আমাকে এনেছে টেনে তোমার উঠোনে।
জানি না পাবো কি আমি তোমার পরশ?
অথচ এখন কেন তোমাকে যে চায়।
কঠিন পাথর তুমি। আমার এ প্রেম।
সেখানে আঘাত খেয়ে শুধু ফিরে আসে (প্রাগুক্ত পৃঃ ১৬১)

৭.০ লুসাই

৭.১ রাঙামাটি পার্বত্য জেলার সাজেক অঞ্চলে লুসাইরা বসবাস করে থাকে। ১৮৭১ সালের পর লুসাই পার্বত্য এলাকা থেকে তারা এখানে আসে বলে তাদেরকে লুসাই বলা হয়। আবার ক্যাপ্টেন হার্বাট লুই মনে করেন, লুসাই ভাষায় 'লু' (মাথা) এবং 'সাই'

(কর্তন) অর্থাৎ যারা মাথা কাটে তাদেরকে লুসাই বলে। সাজেক অঞ্চলের নিকটে রূপ লুই, লেংকর, কাংলাক, শিয়ালদুলুই, তুইকুই, তলেসপুরই মৌজায় এদের সংখ্যা অত্যধিক।

৭.২ লুসাইদেরকে এককালে খুবই হিংস্র মনে করা হত। কিন্তু একথা মানতে তারা রাজী নয়। এরা বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ঃ থাংগুর, পাচুয়াও, চাংতে, চুংতে চুআ চাং, চুআওংগু, হাউনাব, হারশেল, হুয়ালহাং, লুংগথুআ, তুনুং, তাংসুং। এই মূল গোত্রগুলো আবার বিভিন্ন সহগোত্রে বিভিক্ত।

৭.৩ লুসাইরা জড়োপাসনা বা প্রেতপূজা (Animism) করে থাকে। তাদের বিশ্বাস 'পাথিয়ান' নামে একজন দেবতা এ বিশ্ব ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছেন। তিনি সর্বশক্তিমান এবং কখনও কারও অমঙ্গল কামনা করেন না। তবে ব্যাধি-অমঙ্গল সব কিছুই আসে লুয়াই নামে কিছু দৈত্যদানব থেকে, যাদেরকেও তারা দেবতা বলে বিশ্বাস করে। এছাড়া খোয়াবং, মিভেংগতু, সাধু-আ, তুইহুয়াই ও রামহুয়াই নামে আরও কিছু দেবদেবীর পূজা তারা করে থাকে।

৭.৪ লুসাই সমাজে পণপ্রথা প্রচলিত আছে। বিয়ের পূর্বেই এ পণ দিতে হয় এবং বরপক্ষ এ পণ দিয়ে থাকে। তারা একই গোত্রে (Endogamy) বিয়ে করাকে রীতি -বিরুদ্ধ মনে করে। তবে ভিন্ন গোত্রে বিয়ে (Exogamy) করতে কোন আপত্তি নেই। এদের সমাজে তালাক প্রথা প্রচলিত এবং তা গ্রামের উপা বা মাতব্বরদের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়।

৭.৫ লুসাইদের সমাজ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ। পিতার মৃত্যুর পর শুধু কনিষ্ঠতম পুত্র সম্পত্তির মালিক হয়ে থাকে। অন্যান্য ছেলেরা তার কৃপার পাত্র হয়ে থাকে। বিধবা মা পুনরায় বিয়ে করলে তার সম্পত্তি তার ছেলেদের মধ্যে বন্টন করা হয়। কেও অপুত্রক হলে 'সাফুম' উৎসবের মাধ্যমে তার সম্পত্তির মালিকানা নিকটস্থ কোন আত্মীয়ের হাতে সমর্পণ করা হয়।

৭.৬ লুসাইরা মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে পূজা করে থাকে। কারণ তারা বিশ্বাস করে মৃত্যুর পর আর একটি জগৎ আছে এবং মৃত ব্যক্তিদের আত্মা মিথিখো-আ নামে গহীন অরণ্যের কোন স্থানে অবস্থান করে।

৮.০ মুরং

৮.১ বান্দরবন পার্বত্য জেলায় মুরংরা বসবাস করে থাকে। তারা পূর্বে আরাকানের অধিবাসী ছিল। খুমিদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে তারা বর্তমান আবাসস্থলে অবস্থান গ্রহণ করে।

৮.২ মুরংরা শুধু ইহকালে বিশ্বাস করে। পরকালে তাদের কোন বিশ্বাস নেই। ইদানীং কিছু কিছু মুরং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বলে নিজেদেরকে দাবি করলেও বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে তাদের পূজা-পার্বণের রীতিনীতির অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

৮.৩ মুরং সমাজে যুবক-যুবতীদের মন দেয়া-নেয়ার মাধ্যমে বিয়ে প্রচলিত থাকলেও পিতা-মাতা বা অভিভাবকদের মতের গুরুত্ব দেয়া হয়। এরা ভিন্ন ভিন্ন গোত্রে বিয়ে

করতে পারে তবে একই পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ। বিয়েতে পণপ্রথা প্রচলিত আছে এবং তা কণে পক্ষকে দিতে হয়। এ পণের টাকা সাধারণত বিয়ের আনন্দ উৎসবে খরচ করা হয় এবং তাতে উভয় পক্ষের সম্মতি থাকে।

৮.৪ মুরং সমাজে কোন ধর্মযাজক বা পুরোহিত নেই। সকল প্রকার ধর্মীয় আচার-আচরণ এবং বিয়ে পড়ানোর কাজ তারা নিজেরাই করে থাকে। এদের সমাজে তালাক প্রথা প্রচলিত আছে। তবে বিনা কারণে স্ত্রীকে তালাক দিলে সমাজে তা নিন্দনীয় হিসেবে দেখা হয় এবং স্বামীকে একটি দা দিয়ে সমাজ থেকে বের করে দেয়া হয়। জীবজন্তুর মতই সমগ্র বনভূমি তার বিচরণ ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণ লোকদের মাঝে বিধবা বিয়ের প্রচলন আছে, তবে সম্ভ্রান্ত বা রাজপরিবারে বিধবাদের বিয়ে দেয়া যায় না। মুরং সমাজে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করার কোন নিয়ম নেই।

৮.৫ মুরং সমাজের অধিবাসীরা পিতৃপ্রধান গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এ সমাজে মেয়েরা পুরুষদের তুলনায় অধিকতর কাজ করে এবং তারা বেশি কর্মঠ। সংসারের যাবতীয় কাজ মেয়েরা পুরুষদের পাশাপাশি করে থাকে। জুম চাষেও বন থেকে কাঠ কাটার সময় মুরং মেয়েরা পুরুষদের সহায়তা করে থাকে। এছাড়া তারা হাটে বাজারে বেচাকেনার কাজ করে থাকে। পিতার মৃত্যুর পর সম্পত্তি ছেলেদের মধ্যে ভাগ হয়ে যায় এবং সর্ব কনিষ্ঠ ছেলে সর্বাধিক সম্পত্তি পায় বলে জীবিতাবস্থায় পিতা-মাতা কনিষ্ঠতম পুত্রের সঙ্গে সববাস করে। মেয়েপুরুষ উভয়েই কঠোর পরিশ্রম করে বলে মুরংরা সাধারণত আশি নব্বই বছর পর্যন্ত জীবিত থাকে এবং এদের মধ্যে অসুখ নেই বললেই চলে।

৯.০ টিপরা

৯.১ ষোড়শ শতাব্দীর পরে পার্বত্য ত্রিপুরা থেকে টিপ্‌রারা বর্তমান তিনটি পার্বত্য জেলাতে চলে আসে। এরা এ তিনটি জেলাতেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তবে রামগড় এলাকাতেই তাদের বসবাস সবচেয়ে বেশি।

৯.২ টিপরারা নিজেদের হিন্দু বলে দাবি করলেও পূজা পার্বণে উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে ধর্মীয় আচারে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। এদের মাঝে এখনও প্রাচীন পদ্ধতির ধারাগুলো খেয়াল করা যায়। টিপ্‌রা সমাজে এক প্রকারের বৈরাগীর সন্ধান পাওয়া যায়। তাদের জন্য বিয়ে এবং সংসার ধর্ম পালন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তারা শুধু সৎকর্ম করার অধিকারী এবং জীবিকার্জনের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়ায়।

৯.৩ টিপ্‌রা সমাজ বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত। এসকল গোত্র পিতৃপ্রধান। মেয়েদের কোন প্রভাব নেই। বাইরের গোত্র থেকে এদের স্ত্রী গ্রহণ করতে হয়। একই গোত্রে বিয়ে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এপ্রথা উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের কথাই মনে করিয়ে দেয়। বিয়ের অনুষ্ঠানের দু' বছর পর কণেকে বরের বাড়িতে আনুষ্ঠানিকভাবে আনা হয়। সাধারণত টিপ্‌রাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে না। তবে কোন পক্ষ যদি একান্তই বিবাহ বিচ্ছেদের ইচ্ছে প্রকাশ করে তবে তাকে উপযুক্ত কারণ দর্শাতে হয়। উপযুক্ত কারণ না দেখাতে পারলেও বিয়ে বিচ্ছেদ হয় তবে সে ক্ষেত্রে দোষী ব্যক্তিকে জরিমানা করা হয়। প্রেমের কারণে এ সমাজে বিয়ের প্রচলন আছে। বিধবাদের বিয়ের ক্ষেত্রে তাদের মতামতকেই প্রাধান্য দেয়া হয়।

৯.৪ অন্যান্য পাহাড়ী ক্ষুদ্র জাতির মত টিপ্‌রারা জুম চাষের ওপর নির্ভরশীল এবং এ কাজে নারী-পুরুষ উভয়েই অংশগ্রহণ করে থাকে। এতে সংসারযাত্রা নির্বাহে সহায়তার সঙ্গে দাম্পত্য প্রেম ঘনীভূত হয়।

৯.৫ ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে প্রেমের মাধ্যমে টিপরা সমাজে বিয়ে হয়ে থাকে। সুমধুর গানের সুর দিয়ে যুবকরা যুবতীদের হৃদয় হরণের চেষ্টা করে। নিচে একটি প্রেম সঙ্গীত দেয়া হলঃ

হালাপ বারা অ থায়ে
ববার সিকলা কানলিয়া
বাথাই চেরাওক রাওক থুংলিআ।
লামানি বোর্কুংগ যায়তালাই
ববার সিকালা কান খামো
বথায় চেরাওক রাওক থুংখামো।

অনুবাদ ঃ

কেন ফুল ফোটে এ বনের বাগানে?
এখানে আসে না কেও সে ফুল খোপায় গুঁজে নিতে
সে কথা কেও কভু জানে?
যে ফুটে না এ মনের বাগানে
যে ফুল জানে না হায় আমার প্রেমের কোনো মানে
কি লাভ সে ফুল দিয়ে, যে ফুল একাকী ঝরে যায়?
যদি বা ফুটতো ফুল আমার প্রিয়ার বাগিচায়,
তবে সে গুঁজতো ফুল কী উল্লাসে আপন খোঁপায়।(আবদুস্ সাত্তার, পৃঃ২২১)

১০.০ সেন্দুজ

১০.১ সেন্দুজদের আদি নিবাস ছিল চীন দেশের ব্লু মাউন্টেন অঞ্চল। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের পর তারা তাদের বর্তমান আবাসস্থলে আছে। এরা গহীন অরণ্যেই থাকতে ভালবাসে এবং সাধরণত শহরে আসে না। কোন কোন নৃতত্ত্ববিদ মনে করেন যে সেন্দুজরা পাঙ্খো ও বনজোগীদের ভিন্ন শাখা মাত্র এবং ভাষাগত ব্যাপারেও তাদের সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

১০.২ সেন্দুজরা প্রধান চারজন দেবতার উপাসনা করে থাকে। তাদের মতে পত্যেনই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা এবং দিন শেষে সূর্য তাঁরই ঘরে আশ্রয় নিয়ে থাকে। অন্য তিন জন দেবতা হলেন ঃ খোজিং, সুরপার ও ওয়ানচং। সেন্দুজরা পাথরকে খুব পবিত্র মনে করে।

১০.৩ যৌবনপ্রাপ্ত হলেই ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেয়া হয়। প্রেমঘটিত বিয়ের রীতি সমাজে থাকলেও বিয়ের ব্যাপারে অভিভাবকদের মতই চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হয়।

১০.৪ পূর্বে সেন্দুজরা জুম চাষের ওপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু বর্তমানে তারা সমতলের অধিবাসীদের মতই চাষাবাদ করে। নারীপুরুষ উভয়েই এ কাজে আনন্দের সঙ্গে

অংশগ্রহণ করে থাকে। সাংসারিক কোন প্রয়োজনেই তারা অন্যের উপর নির্ভর করতে পছন্দ করে না। এমন কি গভীর বনের এক ধরনের মাটি থেকে তারা লবণ তৈরী করে নিজেদের প্রয়োজন মেটায়।

১১.০ পাঙ্খো ও বনজোগী

১১.১ ব্রহ্মদেশে অবস্থিত চীন-পর্বত এলাকার দক্ষিণে 'এমন' ও উত্তরে 'মো' উপত্যকাভূমির মধ্যবর্তী অঞ্চলসমূহে ছিল পাঙ্খো ও বনজোগীদের আদি নিবাস। খুশিদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে সপ্তদশ শতাব্দীতে তারা বান্দরবন পার্বত্য জেলায় এসে বসবাস শুরু করে। পাঙ্খো ও বনজোগী একই জাতির দুটি শাখা এবং দু'ভাই থেকে এদের বংশোদ্ভব ঘটেছে। এ দুই শাখার মধ্যে ভাষাগত ও সমাজের প্রচলিত রীতিনীতিতে বেশ মিল রয়েছে।

১১.২ পাঙ্খো ও বনজোগীরা বিশ্বাস করে যে, এ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন পত্যেন নামক একজন দেবতা। এ দেবতা লুসাইদের পুথিয়ান-এর সমকক্ষ। তিনি বিশ্ব-ভূমন্ডলের পশ্চিমাংশে বসবাস করেন এবং দিন শেষে সূর্য তাঁর ঘরে আশ্রয় নেয়। তাদের খোজিং নামে আরও একজন বনদেবতা আছে এবং জুম চাষে সাহায্য করে থাকেন। এ পাঙ্খো ও বনজোগীরা জুম চাষের ওপর নির্ভরশীল এবং অধিকাংশ পূজা-পার্বণ এ খোজিং দেবতার নামে উৎসর্গ করা হয়। এদের সমাজে কোবাং নামে এক ধরণের ধর্মপরায়ণ লোকের দেখা পাওয়া যায়। তারা ধর্মচর্চা ও পবিত্র জীবনযাপন করে।

১১.৩ পাঙ্খো ও বনজোগীদের একই গোত্রে বিবাহ বিষিদ্ধ। বাইরে থেকে স্ত্রী গ্রহণ করতে হয়। যৌবন প্রাপ্ত হলেই ছেলেমেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এ ব্যাপারে পিতামাতা বা অভিভাবকদের মতই চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে মন দেয়া নেয়ার কারণেও বিয়ে হয়ে থাকে। বিধবারা পুনরায় বিয়ে করতে চাইলে মৃত স্বামীর ভাইদের দাবী আগে বিবেচনা করতে হয়।

১১.৪ সংসারের সকল কাজে যেমন চাষাবাদ কাঠ কাটা ও আহরণে মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে কাজ করে। এদের মেয়েদেরকে হাটে বাজারে বেচাকেনার কাজে দেখা যায়। মুরংদের মত পাঙ্খো ও বনজোগী সমাজের মেয়েরাও খুব পরিশ্রমী এবং পুরুষদের সকল কাজে সহায়তা করে থাকে।

১২.০ খুমি

১২.১ মধু, থানছি, রুমা ও লামা ইত্যাদি থানার অন্তর্গত জঙ্গলাকীর্ণ ভূমিতে খুমিরা বসবাস করে থাকে। এদের আদি নিবাস ছিল আরাকান। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে অন্যান্য কয়েকটি ক্ষুদ্র জাতির সঙ্গে তারা বর্তমান আবাসস্থলে চলে আসে।

১২.২ 'আওয়া খুমি' ও 'আফি-আ খুমি' নামে দুই শ্রেণীতে এই খুমিরা বিভক্ত। 'আওয়া' নদীমুখ ও 'আফি-আ' নদীর উৎস ব্যবহৃত হয়। আওয়া খুমি ও আফি-আ খুমিরা বিশ্বাস করে থাকে যে তাদের আদি পিতামাতা যথাক্রমে নদীমুখ ও নদীর উৎস থেকে জন্ম গ্রহণ করেছে। এ কারণে তাদেরকে শংখ ও মাতামুহুরী নদীর তীরবর্তী

বিস্তীর্ণ জঙ্গলের মধ্যেই অধিক হারে দেখা যায় এবং এ নদীদ্বয়কে কেন্দ্র করেই তাদের অধিকাংশ পূজা-পার্বণ হয়ে থাকে।

১২.৩ খুমিদের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব থাকলেও তারা মূলত জড়বাদী বা ভূতপূজক। লুসাইদের মত এরাও পাথিয়ান দেবতাকে এ বিশ্ব-ভুমন্ডলের সৃষ্টিকর্তা মনে করে। এছাড়া মগদ নামে একজন দেবতা গ্রাম দেবতা (House-hold Deity) এবং বোগলে নামক আর একজন দেবতা জলদেবতা (Water Deity) হিসেবে খুমি সমাজে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে।

১২.৪ খুমিদের সমাজে পুরুষদের প্রভাব সর্বত্রই দেখা যায়। এ কারণে তাদের সমাজ পিতৃপ্রধান। এদের সমাজে নিজ গোত্রে বিয়ে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। যৌবনপ্রাপ্তির পর ছেলেমেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়। বিয়ের আগে খুমি যুবক যুবতীদের মধ্যে সহবাস প্রথা প্রচলিত আছে। তবে মিলনের ফলে কোন যুবতী গর্ভবতী হয়ে পড়লে তাকে বিয়ে করতে তার প্রেমিক চুক্তিবদ্ধ থাকে। এটাকে এক ধরনের বিয়েই বলা চলে। গারো সমাজে নিজ গোত্রে বিয়ে নিষিদ্ধ। স্ত্রী নির্বাচনের জন্য বাইরের গোত্রে যেতে হয়।

এতক্ষণ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব তিনটি পার্বত্য জেলায় যে সকল ক্ষুদ্র জাতি রয়েছে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হল। এবার বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানে যে সকল ক্ষুদ্র জাতির লোকজন বসবাস করে তাদের সম্পর্কে দৃষ্টিপাত করা হবে। তারপূর্বে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্র জাতিসমূহের থানাভিত্তিক লোকসংখ্যার বিবরণ পরিশিষ্ট 'ক' তে দেখা যায়।

১৩.০ গারো

১৩.১ গারো সমাজ একটি মাতৃতান্ত্রিক সমাজ। গারোদের আদি আবাসভূমি ভারতের পূর্ব দিকের আসাম প্রদেশ। গারো পাহাড়ের নাম অনুসারে তাদেরকে গারো বলা হয়। এ সম্প্রদায়ে প্রধানত দুটি শ্রেণী রয়েছে। আঞ্চলিক ভাষায় তাদেরকে আচ্ছিক (Hill Garo) ও লামদানী (Plain Garo) বলা হয়। আচ্ছিক শ্রেণীর গারোরা গারো পাহাড়ের অভ্যন্তরে গভীর বনে বাস করে এবং লামদানী শ্রেণীর গারোদের ময়মনসিংহ জেলার নালিতাবাড়ি, হালুয়াঘাট, দুর্গাপুর, কলমাকান্দা ও শ্রীবর্দী এলাকায় অধিকহারে দেখা যায়। এ ছাড়া টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর থানাতেও অনেক গারো বাস করে।

১৩.২ মাতৃপ্রধান সমাজের নিয়মানুযায়ী গারো মেয়েরা মায়ের সম্পত্তি পেয়ে থাকে। ছেলেরা বিয়ের পর বাবার বাড়ি ছেড়ে শ্বশুরবাড়িতে চলে আসে। নারীপুরুষ উভয়ে সংসারে কাজ করলেও তুলনামূলকভাবে পুরুষদের প্রভাব কম।

১৩.৩ অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিসমূহের মত গারোদের মধ্যে গোত্র বিভাগ রয়েছে। আচ্ছিক গারোরা (১) অয়, (২) আবেং ও (৩) সাংগমা নামে তিনটি গোত্রে বিভক্ত।

১৩.৪ গারোদের ধর্মে হিন্দু ধর্মের প্রভাব থাকলেও তাদের মধ্যে অনেক জড়োপাসক ও ভূতপুজারী রয়েছে। তবে গারোদের পুরোপুরি হিন্দু বলা যায় না।

১৩.৫ "গারোদের দেবদেবীর মধ্যে তাডারা রাবুগা-ই প্রধান। তাঁর আদেশেই নস্ত নপাস্তু এবং মাচি পৃথিবী সৃষ্টি করেন। তাছাড়া গারো সমাজে সালজং (সূর্যদেব), ছোছুম (চন্দ্র), নোরিংগ্রো নোজিংজু (তারকারাজি), গোয়েরা (বজ্র) নোরোচিত কিসরী বাক্রী (বৃষ্টি) সেন (মাটি বা পৃথিবী) আছিমা দিংগছিমা (ছোছুম বা চন্দ্রের মা) কালকেম (দোয়ের বা বজ্রের ভাই) চোরাবুদি (শস্যদেবতা), বোকিম(বীজের সার রক্ষক) সিয়াগ্রাং সোলজাং সংগ গিটাংগ (ধানের তত্ত্বাবধায়ক) ও নবাং (মৃতের রক্ষক) প্রভৃতির প্রাধান্য যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানে গারোরা এসব দেবদেবীর পূজা করে থাকে। তাছাড়া পাহাড়া-পর্বত নদনদীকেও দেবতাজ্ঞানে পূজা করতে দেখা যায়। এসব পূজাপার্বণের সঙ্গে কখনো কোনো সংস্কার সম্পৃক্ত থাকে।(আবদুস সাত্তার, পৃঃ ২৬১-২৬২)

১৩.৬ হিন্দুদের মত গারোরা পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে। হিন্দুদের মত গারোরাও বিশ্বাস করে যে এজগতে অসৎ কাজ করলে পরজন্মে মানবেতর জীব হিসেবে জন্ম গ্রহণ করতে হয়।

১৩.৭ পূর্বে গারোরা পাহাড়ী ক্ষুদ্র জাতিসমূহের লোকদের মতই জুম চাষের উপর নির্ভরশীল ছিল। বর্তমানে তারা সমতল ভূমির বাঙালীদের মতই চাষাবাদ করে। নারীপুরুষ উভয়ই এ চাষে অংশগ্রহণ করে। তাছাড়া কৃষিকাজের বাইরে তারা কাঠ কেটে সে কাঠ নিকটস্থ বাজারে বিক্রির ব্যবস্থা করে। কাঠ পুড়িয়ে কয়লা বানিয়েও তারা বিক্রি করে। হাটে বাজারে বেচাকেনা গারো নারী পুরুষ উভয়ই করে থাকে।

১৪.০ হাজং

১৪.১ হাজংরা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের অন্তর্ভুক্ত। বিয়ের ব্যাপারে বা অন্যান্য সাংসারিক কাজে গারোদের মত মেয়েদের প্রভাব হাজং সমাজে নেই। অনেকেই মনে করে থাকে গারো ও হাজং একই গোষ্ঠীভুক্ত দুটি শাখা মাত্র। হাজংরা ময়মনসিংহ জেলার গারো পাহাড় সংলগ্ন সমতল ভূমির সুষং দুর্গাপুর, কলমাকান্দা, নালিতাবাড়ি, হালুয়াঘাট শ্রীবর্দী ও বিরিশিরী এলাকায় বাস করে থাকে। হাজংরা গারোদের মতই আসাম দেশ থেকে তাদের বর্তমান আবাসস্থলে চলে আসে। কিন্তু হাজংরা নিজেদেরকে সনাতনপন্থী হিন্দু বলে স্বীকার করে। এমনকি নিজেদেরকে ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভুত বলেও দাবি করে থাকে।

১৪.২ হাজংরা মাত্র দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত (১) বায়্যাবছড়ি ও (২) পরমার্থী। এ পরমার্থীরা হিন্দুদের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মত। কেননা তারা গরু ও শুকরের মাংস খেতে পারে না এবং মদ পর্যন্ত তারা স্পর্শ করতে পারে না। মদ তাদের জন্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে বায়্যাবছড়ি গোষ্ঠীর লোকেরা হিন্দুদের শাক্তদের মত জীবনযাপন করে।

১৪.৩ হাজংরা হিন্দুদের প্রায় সব দেব-দেবীকেই মান্য করে থাকে। তবে শিব ও দুর্গার প্রতি তারা সর্বাধিক সম্মান প্রদর্শন করে। পূর্বে বিয়ে বা পূজা -পার্বণে হাজংরা কোন ঠাকুর বা পুরোহিতের শরণাপন্ন হত না। বর্তমানে পুরোহিতের প্রচলন করা হয়েছে।

১৪.৪ হাজং রমণীরা সাধারণত স্বামীর প্রতি খুবই বিশ্বস্ত হয়। অন্তর্বিবাহ ও বহির্বিবাহ এক কালে হাজং সমাজে প্রচলিত ছিল। তাছাড়া দুই গোত্রের চিতর বা একই গোত্রের মধ্যে বিয়ে চালু আছে। বিয়ের পূর্বে কোন মেয়ে গর্ভবর্তী হলে দায়ী পুরুষকেই তাকে বিয়ে করতে হয়। সাধারণত পিতামাতা বা অভিভাবকদের মতের ওপর নির্ভর করে ছেলেমেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু পরমার্থী গোত্রে বিয়ের ব্যাপারে ছেলেমেয়েদের মতামত প্রাধান্য পায়। হাজং সমাজে বাল্য বিয়ে নেই বললেই চলে এবং স্ত্রী বন্ধ্যা না হলে সাধারণত দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করা হয় না।

১৪.৫ বিবাহ বিচ্ছেদ এ সমাজে প্রচলিত আছে, তবে গর্ভবর্তী স্ত্রীকে তালাক দেয়া সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। বিধবা বিয়ের নিয়মও এ সমাজে আছে কিন্তু মৃত স্বামীর কোনো ভাইয়ের সঙ্গে এ বিয়ে হতে পারে না। এটা একটা আশ্চর্য ব্যতিক্রম। পরমার্থীগোত্রে বিধবা বিয়ের প্রচলন নেই।

১৪.৬ পিতার সম্পত্তিতে মেয়েদের কোন অংশ নেই। তবে বিয়ের সময় মেয়েদের প্রচুর যৌতুক দিতে হয়। এ প্রথা চাকমা, টিপরা ও তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে প্রচলিত। ছেলেরা সমান হারে পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ পায়।

১৪.৭ পূর্বে হাজংরা জুম চাষের ওপর নির্ভরশীল ছিল। বর্তমানে তারা সমতলভূমির মতই চাষাবাদ করে থাকে। নারীপুরুষ উভয়েই এই কাজে অংশগ্রহণ করে। তাছাড়া কাঠ কাটা এবং কাঠ পুড়িয়ে কয়লা তৈরি করে তারা বাজারে বিক্রি করে। নারীরা দল বেঁধে গভীর অরণ্যে কাঠ কাটতে যায়।

১৫.০ মনিপুরী

১৫.১ মনিপুরীরা বর্তমান ভারতের মনিপুর প্রদেশ থেকে ১৭৬৫ সালের পর সিলেটে চলে আসে। অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতির মত তারাও সিলেটের ভূমিজ সন্তান নয়। ঢাকার মনিপুরপাড়া এক সময় মরিপুরীদের আবাসস্থল ছিল। এছাড়া সিলেট শহরের কাছে মনিপুরপাড়া, মৌলভীবাজার জেলার ভানুগাছ এবং হবিগঞ্জ জেলার আসামপাড়া অঞ্চলে মনিপুরীরা বসবাস করে থাকে।

১৫.২ মনিপুরীদের মধ্যে একই গোত্রে বিয়ে নিষিদ্ধ। মেয়ের জন্য অন্য গোত্রের সঙ্গে সম্পর্ক করতে হয়। মনিপুরীদের সমাজে নিম্নশ্রেণীর এক ধরনের লোকজন আছে যারা ধনীদের বাড়িতে কাজকর্ম করে জীবিকা নির্বাহ করে এবং হিন্দুদের শূদ্র শ্রেণীর মত এদর সামাজিক মর্যাদা নেই বললেই চলে। বিধবা বিয়ে ও বিবাহ বিচ্ছেদ মনিপুরী সমাজে প্রচলিত। তালাকপ্রাপ্ত রমণী পানি খাওয়ার পাত্র এবং কটিদেশ আবৃত করার পরিধেয় কাপড় ছাড়া সংসারের অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে যেতে পারে।

১৫.৩ বিভিন্ন গল্প উপন্যাস ও প্রেমকাহিনীতে মনিপুরী সাহিত্য ভরপুর। তাছাড়া মনিপুরী নৃত্য এ উপমহাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে একটি অনন্যসাধারণ স্থান দখল করে আছে।

১৬.০ খাসীয়া

১৬.১ খাসীয়ারা ভারতের আসাম প্রদেশের খাসীয়া, জৈন্তিয়া পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস করে। বাংলাদেশের সিলেট জেলার জৈন্তিয়াপুর, জাফলং, তামাবিল এবং সুনামগঞ্জ জেলার খাসীয়া, জৈন্তিয়া পাহাড়ের সীমান্তবর্তী অংশে অনেক খাসীয়া বসবাস করে থাকে। অনেকেই মনে করে প্রায় পাঁচশ' বছর পূর্বে খাসীয়ারা এসব এলাকায় এসে বসবাস শুরু করে।

১৬.২ উব্লাউ নাংমউ খাসীয়ারদের প্রধান দেবতা। তাছাড়া আরও অনেকগুলো দেবতার প্রাধান্য খাসীয়া সমাজে বিদ্যমান।

১৬.৩ এদের মধ্যে রয়েছে উব্লাউ মুলুক (সাম্রাজ্যের পরিচালক), উব্লাউ মতুং (জলদেবতা), উব্লাউ সংসপাহ (ধনসম্পদের দেবতা) উরিং কেউ (গ্রামদেবতা), কায়িহ (রোগজ্বরার দেবতা) ও কাখলাম (কলেরা মহামারীর দেবতা)" । প্রাগুক্ত পৃঃ ৩২৯) খাসীয়ারা পরজন্মে বিশ্বাস করে না। বিবেকের শাসনকেই তারা সবচেয়ে বড় শাসন বলে মনে করে।

১৬.৪ খাসীয়াদের মধ্যে একাধিক গোত্র রয়েছে। বিয়ের জন্য অন্য গোত্র থেকে মেয়ে আনতে হয়। কারণ একই গোত্রে বিয়ে নিষিদ্ধ। খাসীয়া সমাজ মাতৃপ্রধান এবং সে কারণে সমাজের সকল ক্ষেত্রে মেয়েদের প্রাধান্য দেখা যায়। মেয়েরা স্বেচ্ছায় স্বামীকে তালাক দিতে পারে। পক্ষান্তরে স্বামী দ্বিতীয় বার বিয়ে করতে পারে। বিয়ে সাধারণত ছেলেমেয়েদের পছন্দ অনুসারেই হয়ে থাকে।

এসব ছাড়াও বাংলাদেশের রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া অঞ্চলে সাঁওতাল, ওরাওঁ ও রাজবংশী নামে ক্ষুদ্র জাতিসমূহ বসবাস করে থাকে। এদের জীবনযাত্রার মধ্যে আছে বৈচিত্র ও সরলতা। এরা সবাই মানবিক গুণাবলীর অধিকারী। এদের লোকগাঁথা, কথা, উপকথা ও নানাবিধ কাহিনী বাংলাদেশের শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে।

১৭.০ উপসংহার

১৭.১ পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা সহজেই বলতে পারি যে, বাংলাদেশের সকল ক্ষুদ্র জাতিসমূহের নিজস্ব সমাজ ব্যবস্থা, ধর্ম, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক জীবন রয়েছে। তাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি, লোককাহিনী, কথা,উপকথা বাংলাদেশের সামগ্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে নানা ভাবে উন্নত করেছে। এ সকল পাহাড়ী লোকদের জীবনধারাকে বাংলাদেশের সমতলভূমির জীবনযাত্রার পরিপূরক করে তোলার জন্য আমাদের বিশেষভাবে খেয়াল করতে হবে। তাদের জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য সকল প্রকার সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।

১৭.২ বর্তমানে কিছু বিপথগামী চাকমাদের জন্য পার্বত্য জেলাসমূহে বিশেষ করে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় মাঝে মাঝে কিছুটা অশান্তি দেখা যায়। এ সমস্যা সমাধান করার জন্য গত দেড়যুগ ধরে বাংলাদেশ সরকার তার সাধ্যমত চেষ্টা করছে। যে সব চাকমারা শরণার্থী হিসেবে ভারতে চলে গিয়েছিল তারা বর্তমানে বাংলাদেশে তাদের

নিজ বাসভূমিতে ফিরে আসছে এবং তাদের পূণর্বাসনের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে এ সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধান হবে বলে আশা করা যায়।

বিঃ দ্রঃ প্রবন্ধটি বিপিএটিসি'র বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ চর্চা মডিউলে পাঠ্য বিষয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি

১। চাকমা, জ্ঞানেন্দু বিকাশ, ১৯৯৩ *ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পার্বত্য স্থানীয় সরকার পরিষদ*, রাঙামাটি, স্থানীয় সরকার পরিষদ, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা।

২। সাত্তার, আবদুস, ১৯৭৫ *অরণ্য জনপদে*, ঢাকা, আদিল ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানী, পৃঃ ২০, ৩৯, ৬৩, ১৩৩, ১৬১, ২২১, ৩২৯,

৩। সাত্তার, আবদুস, ১৯৭৯ *উপজাতীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী।

৪। সাত্তার, আবদুস, ১৯৮০ *গারোদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী।

৫। সাত্তার, আবদুস, ১৯৭৭ *অরণ্য সংস্কৃতি*, ঢাকা, মুক্তধারা।

৬। Bangladesh Bureau of Statistics, 1995 *Statistical Pocket Book, 1994*, Dhaka, 1995, pp 108-109.

৭। Bessaignet, Pierre, 1958 *Tribesmen of the Chittagong Hill Tracts*, Dhaka, Asiatic Society of Pakistan, p.4

৮। Bessaignet, Pierre (Ed)1964 *Social Research in East Pakistan*, Dhaka, Asistic Society of Pakistan, 1964.

৯। Chowdhury, Anwarullah et al (Ed)*1987 Socialogy of Bangladesh Problems ands Prospects* Dhaka, Bangladesh Sociology Association,

১০। Richter, Maujrice N, 1987 *Exploring Sociology*, Illinois, F, E, peacock Publishers, INC, .

১১। Shelley, Mizanur Rahman (Ed) 1992, *The Chittagong Hill Tracts of Bangladesh, The Untold Story*, Dhaka, Centre For Development Research, Bangladesh.

Tribal household and population by tribe, 1991

Locality & Tribe	Bangladesh		Barisal Division		Khulna Division		Chittagong Division		Dhaka Division		Rajshahi Division	
	H. hold	Popn	H. hold	Popn	H. hold	Popn	H. hold	Popn	H. hold	Popn	H. hold	Popn
Total	233417	1205978	7591	40506	7723	40558	129856	687319	24994	123258	63253	314337
Bangshi	419	2112	-	-	-	-	-	-	419	2112	-	-
Bawm	1349	6978	-	-	-	-	1349	6978	-	-	-	-
Buna	2822	13914	-	-	-	-	-	-	-	-	2822	13914
Chak	372	2000	-	-	-	-	372	2000	-	-	-	-
Chakma	46637	252986	205	1049	119	614	45748	248321	564	2999	1	3
Coach	2541	12631	-	-	-	-	-	-	2541	12631	-	-
Garo	14042	68210	-	-	-	-	1310	6859	12505	60221	227	1130
Hajong	2337	11477	8	52	-	-	439	2325	1890	9100	-	-
Harijon	12	63	-	-	12	63	-	-	-	-	-	-
Khasia	2506	13412	-	-	-	-	2292	12280	-	-	214	1132
Khyang	418	2345	-	-	-	-	418	2345	-	-	-	-
Khomoi	238	1241	-	-	-	-	238	1241	-	-	-	-
Lushai	124	662	-	-	-	-	124	662	-	-	-	-
Mahat/Mahatto	668	3534	-	-	-	-	-	-	-	-	668	3534
Marma	30004	154216	296	1523	22	107	29274	150419	410	2159	2	8
Monipuri	4712	24902	-	-	-	-	4712	24902	-	-	-	-
Munda/Mundia	394	2112	-	-	392	2101	-	-	-	-	2	11
Murang	4273	22178	-	-	-	-	4273	22178	-	-	-	-
Muro/M0	620	3211	-	-	-	-	18	126	-	-	602	3085
Pahari	357	1853	-	-	-	-	-	-	-	-	357	1853
Pankue/Pankoo	588	3227	-	-	-	-	588	3227	-	-	-	-
Rajbangshi	1085	5444	-	-	476	2474	-	-	-	-	609	2970
Rakhain	3017	16932	708	3415	-	-	2309	13517	-	-	-	-
Saontal	40950	202744	-	-	575	3172	1977	10380	157	833	38241	188359
Tanchanghya	4043	21057	-	-	-	-	4043	21057	-	-	-	-
Tipra	228	1242	-	-	-	-	138	762	90	480	-	-
Tripura	15860	79772	-	-	-	-	15476	77677	380	2061	4	34
Urang	2285	11296	-	-	38	195	776	3930	-	-	1471	7171
Uruo/Urua/Uria	506	2481	-	-	-	-	-	-	-	-	506	2481
Others	50010	261746	6374	34467	6089	31832	13982	76133	6038	30662	17527	88652

Source : Population Census, 1991, BBS.Statistical Pocket Book, 1994 PP.108-109